দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ১

কালরাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

• গোপাল চন্দ্র দাস •

১৯৭১ সালের আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শিক্ষার্থীরা সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে ওঠে। এর পথ ধরেই ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভা। সেদিন আমি দেখেছি ওই ছাত্র-জনসভায় চারদিক থেকে অসংখ্য মিছিল এসে যোগ দিচ্ছে। খণ্ড খণ্ড মিছিলগুলোর একটি কলাভবনের মূল গেট হয়ে ভেতরের লনে প্রবেশ করেছে। সেই মিছিলের অগ্রভাগে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী কলাভবন পশ্চিম গেটে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করান। সভায় সে সময়ের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসু সহ-সভাপতি শাহ আ স ম আবদুল রব, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন বক্তব্য রাখছিলেন। এক পর্যায়ে বাঙলাদেশের পতাকাটি অস্থায়ী মঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করান। সভায় সে সময়ের ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, ডাকসু সহ-সভাপতি শাহ আলম আবদুল রব, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন বক্তব্য রাখছিলেন। এক পর্যায়ে বাঙলাদেশের পতাকাটি অস্থায়ী মঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান ছাত্রনেতা নজরুল ভাই। আ স ম আবদুর রব নিচ থেকে পতাকাটি অস্থায়ী মঞ্চে তুলে দেন। পরে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পতাকাটি উত্তোলন করেন। তার আগের দিন অর্থাৎ ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) দক্ষিণ দিকে খসরুর নেতৃত্বে একটি দলকে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে দেখেছি। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় জগন্নাথ হল মাঠে। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আজাদ ওই সময়ে প্রতিদিন বিকেলে যখন প্রশিক্ষণে যেতেন তখন আমাকে বলতেন, 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' আজাদের মুখচ্ছবিতে সবসময়ই একটা হাসি ও স্বাধিকারের ঝলক দেখেছি। বেতিয়ারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন আজাদ।...
২৫ মার্চ বিকেল ৪টার পর কলাভবনের ডাকসু কার্যালয়ের কক্ষগুলো যখন তালা লাগিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, তখনও বুঝতে পারিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমে আসবে ভয়ানক কালরাত্রি। রাত ১১টার পরপরই পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আচমকা বাঙালি নিধনের বর্বর খেলায় মেতে ওঠে, শুরু হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। সূর্যসেন হল ক্যাফেটারিয়ার পেছনে বিশাল বস্তির শিমুল তলায় হাসেম আলীর ঘরে ২৫ মার্চ রাতে আমি আমার বাবাসহ অবস্থান করছিলাম। হাসেম আলী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবের প্রহরী। সে রাতে প্রত্যক্ষ করেছি নিরীহ বস্তিবাসীর ওপর পাকিস্তানীদের গুলি চালানোর দৃশ্য। সেদিন আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা অসহায় বাঙালিদের পালাতে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিল। অনেকেই তখন ধারণা করেছিলাম আযানের সময় জল্লাদের নিধনযজ্ঞ কিছুটা হলেও বন্ধ থাকবে, কিন্তু তা থাকেনি। আমি প্রাণ হাতে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে মধুর ক্যান্টিনের দিকে এলাম উৎকণ্ঠা নিয়ে। ... মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে রওনা হলাম শিববাড়িস্থ স্টাফ কোয়ার্টারে, মধুদার বাড়ির দিকে। তার বাড়ির সামনে আসতেই চোখে পড়লো সিঁড়িতে রক্তের দাগ। উপরে বাসার সামনে দরজা বন্ধ! কাউকে না পেয়ে ফিরে আসার সময়ই তোতা মিয়া আমাকে বলল, 'সাব মালাউন কো গাড্ডামে ফেক দিয়া, তোম মরগে।'
এই তোতা মিয়া ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী।
২৬ মার্চের সকালটা ক্যাম্পাস যেনো মৃত্যুপরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অনেকের লাশ পড়ে আছে এখানে ওখানে। তারপর আমি আসি কাঁটাবনের শিমুলতলার ঘরে।
পরদিন ২৭ মার্চ, ১৯৭১। পড়ন্ত বিকেলে আমার বাবা এবং আমি ঢাকা ছাড়ার প্রস্তুতি নেই। কাঁটাবন বস্তি থেকে নীলক্ষেত সড়কের পথ ধরে রোকেয়া হলের পাশের ফুটপাত দিয়ে শামসুন্নাহার হল গেটের সামনে দিয়ে পশ্চিম দিকে যেতেই ওই হলের স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে স্তূপীকৃত লাশ আমাদের চোখে পড়ে। সেদিনের হতভাগ্য মানুষগুলোর পরিচয় আজো অজানা।
(মূল রচনার বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে)